আধুনিক বিশ্লেষণমূলক অর্থনীতিচর্চার পথিকৃৎ

পল স্যামুয়েলসন এক বার বলেছিলেন, যে কোনও বিষয়ে অগ্রগতি হয় এক অন্ত্যেষ্টি থেকে আর এক অন্ত্যেষ্টিতে। অর্থাৎ, পুরনো তত্ত্বের ধ্বংসস্তূপে হয় নতুন তত্ত্বের সৌধনির্মাণ। তাঁর সাম্প্রতিক মৃত্যুতে এই কথাটি মনে পড়ে গেল। সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। স্যামুয়েলসন নিজে এই নিয়মের এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। এখনও সদ্য কলেজে ভর্তি হওয়া অর্থনীতির ছাত্র যখন হাতে তুলে নেয় নতুন বইয়ের মায়াবী গন্ধমাখা প্রথম পাঠ্যপুস্তক, তার পাতায় পাতায় আছে স্যামুয়েলসনের স্বাক্ষর। এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার দীর্ঘ বন্ধুর পথে যখন প্রথম দ্বিধাজড়িত পা ফেলে কোনও নবীন গবেষক, তার লাঠির ডগায় বাঁধা কোনও পুঁটুলিতে সামান্য যে কয়েকটি সরঞ্জাম তার মহার্ঘ সম্বল, তার অনেকগুলিরই নির্মাতা পল অ্যান্টনি স্যামুয়েলসন।

বিংশ শতাব্দীর প্রভাবশালী অর্থনীতিবিদের তালিকায় আছে অনেক কিংবদন্তিসম নাম। যেমন, জন মেনার্ড কেইনস, জন হিকস, জোন রবিনসন, জন ন্যাশ, কেনেথ অ্যারো, এবং মিল্টন ফ্রিডম্যান। কিন্তু একটা ব্যাপারে আধুনিক অথনীতিতে স্যামুয়েলসনের অবদান অ-তুলনীয়— তিনি অর্থনীতিকে সংহত এবং সূত্রবদ্ধ করেছেন, এই শাস্ত্রটিকে একটি অভিন্ন ভাষা দিয়েছেন। এটা তিনি প্রথমত করেছেন নিজের অসামান্য সব তাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে, যে সব গবেষণা সম্পূর্ণ নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে, যেগুলির জন্য অনেকের মতেই তিনি সাত-আটটি নোবেল পুরস্কার পেতে পারতেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, তাঁর লেখা অর্থনীতির পাঠ্যবই ‘ইকনমিকস: অ্যান ইনট্রোডাকটরি অ্যানালিসিস’ও এ ব্যাপারে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে। সাহিত্যের তুলনা দিলে বলতে হয়, স্যামুয়েলসন একাধারে আধুনিক বিশ্লেষণমূলক অর্থনীতির ভাষার প্রধান বৈয়াকরণ এবং সেই ভাষার সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যেও অগ্রগণ্য।

স্যামুয়েলসন-এর কাজের বা তাঁর প্রভাবের বিস্তারিত মূল্যায়নের চেষ্টা করাও এই স্বল্প পরিসর লেখায় অসম্ভব। তাই সংক্ষেপে অর্থনীতির নানা বিভাগে তাঁর মুখ্য অবদানগুলির একটি অসম্পূর্ণ তালিকা বানানোর চেষ্টা করা যেতে পারে মাত্র।

স্যামুয়েলসন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছিলেন ১৯৪১ সালে, তখন তাঁর বয়স মাত্র ছাব্বিশ। তাঁর থিসিসটি ১৯৪৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ‘ফাউন্ডেশনস অব ইকনমিক অ্যানালিসিস’ নামক সেই বইটি অর্থনীতির সর্বকালের অন্যতম ক্লাসিক হিসাবে স্বীকৃত। বইটির শিরোনাম দেখে যদি মনে হয় খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তা হলে এ বইয়ের বিষয়বস্তু দেখে নেওয়া ভাল, তার ব্যাপ্তি এবং গভীরতা একেবারে স্তম্ভিত করে দেয়। তিনি দেখালেন, উপভোক্তা তাঁর ভোগ সম্বন্ধে এবং উৎপাদক তাঁর উৎপাদন সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত নেন, সেগুলির মূল চরিত্র একই— কিছু শর্ত বা সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে কোনও একটি লক্ষ্যবস্তুর সর্বাধিক সম্ভবপর মান অর্জন করা, যেমন উপভোক্তার ক্ষেত্রে তৃপ্তি (কোনও এক অর্থে) এবং উৎপাদকের ক্ষেত্রে মুনাফা। এই সমস্যাটিকে একটি সাধারণ গাণিতিক সমস্যা হিসাবে বিশ্লেষণ করা যায়। অর্থনীতির অন্য অনেক সমস্যাকেই এই একই গাণিতিক কাঠামোয় ধরা সম্ভব। এক বার সেই কাঠামোয় ফেলে দিতে পারলে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত উপায়টি ওই অঙ্ক কষে বের করে ফেলা যায়। আবার ওই মডেলে কোনও কিছু যদি পালটায়, যেমন প্রযুক্তির যদি পরিবর্তন ঘটে, তার ফলে ব্যক্তি এবং সমষ্টির ব্যবহার কী ভাবে পালটাবে, সেটা নির্ধারণ করার নানা উপায়ও স্যামুয়েলসন বের করেছিলেন, তার অনেকগুলিই এখনও অর্থনীতির আলোচনায় বহুব্যবহৃত।

স্যামুয়েলসন আর একটা কাজ করেছিলেন, তিনি মাইক্রোইকনমিকস-এর তত্ত্বকে 'ইউটিলিটি ফাংশন' নামক অতীন্দ্রিয় ধারণাটির বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। অর্থনীতির তত্ত্বে লেখা হত, উপভোক্তা এই ইউটিলিটি ফাংশনটির সর্বোচ্চ মানে পৌঁছতে চায়, কিন্তু ইউটিলিটি ব্যাপারটা ঠিক কী, কী ভাবে তা মাপা যায়, সে কথা কোনও ভাবেই স্পষ্ট হত না। স্যামুয়েলসন দেখালেন, উপভোগ তত্ত্বের (কনজামশন থিয়োরি) জন্য ইউটিলিটি ফাংশন-এর আসলে কোনও দরকার নেই। জিনিসপত্রের দাম বা উপভোক্তার আয় বদলালে চাহিদার ওপর কী প্রভাব পড়ে, সেটা নির্ণয় করাই উপভোগ তত্ত্বের আসল কাজ। উপভোক্তা যদি সম্ভাব্য বিভিন্ন বিকল্পকে কম পছন্দ, বেশি পছন্দ এবং সমান পছন্দ অনুযায়ী ভাগ করে ফেলতে পারে, আর তার পছন্দের মধ্যে যদি একটা সঙ্গতি থাকে, অর্থাৎ দুটি সম্ভাব্য বিকল্পের মধ্যে একটিকে যদি সে এক বার বেছে নিয়ে থাকে, তা হলে সব অবস্থাতেই ওই দুটির মধ্যে সেটিকেই সে বেছে নেয়, তা হলেই উপভোগ তত্ত্বের এই অভীষ্ট কাজটা সেরে ফেলা যায়, ইউটিলিটি মাপার আর দরকার হয় না।

মাইক্রোইকনমিকস-এর যে পদ্ধতিগুলি স্যামুয়েলসন উদ্ভাবন করেছিলেন, সেগুলি কাজে লাগিয়ে তিনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি সুসংহত তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করেন, পরে যে কাঠামোটিকে সমৃদ্ধ করেছেন জগদীশ ভগবতী এবং পল ক্রুগম্যান-এর মতো অর্থনীতিবিদরা। আবার, এলি হেকশার এবং বার্টিল ওলিন-এর কিছু মৌলিক কিন্তু অস্পষ্ট ধারণার ভিত্তিতে স্যামুয়েলসন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি গাণিতিক মডেল তৈরি করলেন, যে মডেল অনেক দিনের অনেক বিভ্রান্তি দূর করে দিল। তাত্ত্বিক কাঠামোকে ঋজু এবং সুনির্দিষ্ট করে তোলার এই কাজটি তিনি বার বার করেছেন। আজও যখন কোনও অর্থনীতিবিদ অসাম্য বা উন্নয়নের ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে চান, তখন তিনি স্যামুয়েলসনের তৈরি করা হেকশার-ওলিন মডেলটি থেকেই তাঁর আলোচনা শুরু করেন।

ঋণ, সঞ্চয়, পেনশন প্রকল্প এবং সামাজিক নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলি বিশ্লেষণের জন্য ম্যাক্রোইকনমিকস-এ ব্যবহৃত প্রধান মডেলটি স্যামুয়েলসনের তৈরি, যা ওভারল্যাপিং জেনারেশনস মডেল নামেই প্রচলিত। এই মডেলে ধরে নেওয়া হয়, কোনও একটা সময়পর্বে দুটি প্রজন্ম বেঁচে আছে, একটি তরুণ অর্থাৎ তারা কর্মী এবং উপার্জনশীল, অন্যটি প্রবীণ অর্থাৎ অবসরপ্রাপ্ত। মূল প্রশ্ন হল, তরুণ প্রজন্ম তাদের আয়ের কত অংশ নিজেদের প্রবীণ বয়সে ব্যবহারের জন্য সঞ্চয় করে রাখবে, কী ভাবে সেই অংশটার পরিমাণ স্থির করবে, কী ভাবে সেটা রাখবে। ধরা যাক, প্রয়োজনীয় পণ্যগুলি জমিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তা হলে এক পর্বে ভোগ না করে অন্য পর্বে সেই ভোগকে কালান্তরিত করার জন্য কোনও একটা উপকরণ দরকার। কী সেই উপকরণ? টাকা, অবশ্যই! টাকা কেবল বাজারে কেনাকাটার জন্য ব্যবহার করা হয় না, এক প্রজন্মের সঙ্গে অন্য প্রজন্মের ভোগ বিনিময়ের জন্যও ব্যবহৃত হয়। ম্যাক্রোইকনমিকস-এ এই সহজ কিন্তু শক্তিশালী ধারণা বড় প্রভাব আছে।

আধুনিক অর্থনীতিতে স্যামুয়েলসনের অবদান নির্ধারণের কথা বলতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্র বাদ পড়ে গেল? সেই তালিকাও অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। প্রথমেই বলতে হয় কল্যাণ-অর্থনীতির (ওয়েলফেয়ার ইকনমিকস) কথা। আব্রাম বের্গসনের সঙ্গে যৌথ ভাবে স্যামুয়েলসন উদ্ভাবন করেন সোশাল ইনডিফারেন্স কার্ভ-এর ধারণাটি। এই ধারণার সাহায্যে একটি অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে আর একটির সামাজিক কল্যাণের নিরিখে তুল্যমূল্য বিচার করা যায়। দ্বিতীয়ত, পার্ক বা উড়ালপুলের মতো যে সব পণ্য কেউ একা ভোগ করে না, সমষ্টিগত ভাবেই যা ভোগ করা যায়, সেই 'পাবলিক গুডস'-এর ক্ষেত্রে স্যামুয়েলসনের তত্ত্ব দেখাল, কেন এই ধরনের পণ্যের জোগান বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না, সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে। এ ছাড়াও আছে আধুনিক আর্থিক লেনদেন (ফিন্যান্স), অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং আধুনিক পুঁজি তত্ত্বগুলিতে তাঁর মৌলিক এবং কালোত্তীর্ণ অবদান।

বিশ্বায়ন শব্দটি নিত্যব্যবহার্য হওয়ার অনেক আগে থেকেই অর্থনীতির শাস্ত্রটি বিশ্বায়িত হয়ে গিয়েছে। বহু দিন হল, বেজিং থেকে বস্টন, কলকাতা থেকে কাম্পালা, লন্ডন থেকে লস অ্যাঞ্জেলেস, দুনিয়ার সর্বত্র অর্থনীতিবিদরা এখন একই ভাষায় কথা বলেন, একই তাত্ত্বিক উপকরণ ও পদ্ধতি ব্যবহার করেন। গোটা দুনিয়ায় অর্থনীতির চর্চাকে একটা অভিন্ন রূপ দেওয়ার ব্যাপারে স্যামুয়েলসনের অবদান সবচেয়ে বেশি। তাঁর উত্তরাধিকার কেবল জোসেফ স্টিগলিটস বা পল ক্রুগম্যান-এর মতো এম আই টি'র গ্র্যাজুয়েট এবং বাম-ঘেঁষা তাত্ত্বিকরাই স্বীকার করেন না, স্বীকার করেন

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণপন্থী অর্থনীতিবিদ রবার্ট লুকাস বা গ্যারি বেকারও।

অর্থনীতিবিদরা একই ভাষায় কথা বলেন বলে এমন কখনওই নয় যে তাঁরা একই ভাবে ভাবেন। তাঁরা ভয়ানক তার্কিক, দ্বিমত হওয়ার সুযোগ পেলে কিছুতেই ছাড়তে চান না। চার্চিলের সেই কথাটা ভুলে গেলে তো চলবে না, যে, একটা ঘরে দুজন অর্থনীতিবিদ থাকলে দুটো মত পাওয়া যাবে, আর তাঁদের এক জন যদি কেইনস হন, তবে তিনটে। কিন্তু বিশ্লেষণের ভাষা এবং পদ্ধতি এক হলে তাঁরা চট করে ধরতে পারেন, মতানৈক্যটা কোথা থেকে উঠে আসছে। এমন হতে পারে, অর্থনীতি কী ভাবে কাজ করে সে বিষয়ে তাঁদের ধারণা একই, কিন্তু বাস্তব তথ্য পরিসংখ্যান সম্পর্কে তাঁদের মত আলাদা। যেমন, জিনিসপত্রের দাম যখন বাড়ে, তখন দুজন অর্থনীতিবিদ তার দু'রকম ব্যাখ্যা দিতে পারেন; এক জন হয়তো বলবেন চাহিদা বেড়েছে বলে দাম বাড়ছে, অন্য জন বলবেন জোগান কমেছে, তাই। অথচ দুজনেই চাহিদা-জোগানের একই তত্ত্ব ব্যবহার করছেন।

আবার এমনও হতে পারে যে, অর্থনীতি কী ভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে দুই অর্থনীতিবিদের মূল ধারণাই হয়তো দু'রকমের। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ইত্যাদির জন্য কৃষিজমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিতর্কে দুটো মত দেখা গিয়েছে। এক দল বলেছেন, প্রয়োজনীয় জমি বাজারেই কেনা উচিত। অন্য দলের মতে, সরকার জমি অধিগ্রহণ করাই শ্রেয়। সরকার এবং বাজারের ভূমিকা এবং আপেক্ষিক দক্ষতা সম্পর্কে এই দু'দলের মধ্যে একটা মৌলিক মতানৈক্য আছে। নির্দিষ্ট এবং বিশদ মডেল তৈরি করে বিশ্লেষণ করার একটা বড় সুবিধা হল, তর্কটা তখন দাঁড়ায় প্রধানত তথ্য নিয়ে। বাস্তব পালটালে সিদ্ধান্তও বদলায়, এবং কিছু মডেল অন্য কিছু মডেলের চেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, বা প্রয়োজন হয় নতুন মডেল খোঁজার। এখানে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। স্যামুয়েলসন নিজেই ক্লিমেন্ট অ্যাটলি সম্পর্কে চার্চিলের করা একটি বিখ্যাত মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, আমাদের অর্থনীতিবিদদের বিনয়ী হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। সাম্প্রতিক কালের বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে দ্বিমত হওয়ার অবকাশ কম।

লেখক লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এ
অর্থনীতির শিক্ষক।